শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সুশোভন চন্দ্র সরকার

দিলীপ কুমার বিশ্বাস

সুশোভন সরকারকে আমি যখন প্রথম দেখি তখন আমি তাঁর ছাত্র নই। মা বাবা ভাই বোন নিয়ে আমাদের ছোট পরিবার। আমার বাবা মুন্সেফ ছিলেন। প্রতি মাঘোৎসবের সময় উনি ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসতেন। সমাজ মন্দিরের উপাসনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। তখন কলকাতার উত্তাল অবস্থা। আইন অমান্য আন্দোলন চলছে। সমাজ-মন্দিরে প্রচন্ড ভীড়। সুশোভন সরকার যেখানেই থাকুন ১১ই মাঘ সমাজ-মন্দিরে সপরিবারে আসতেন। পরে যখন সুশোভন সরকারের ছাত্র হলাম, তখন মনে পড়ল তাঁকে সমাজ-মন্দিরে দেখেছি। কেননা তাঁর চেহারা কখনও ভোলার নয়। দীর্ঘ ঋজু ছিপছিপে গড়ন। ব্যক্তিত্বে-হাসিতে চলনে বলনে যেন একটা সাংস্কৃতিক আভিজাত্য বিচ্ছুরিত হত। তাঁর উজ্জ্বল চোখ এবং সেই সঙ্গে অদ্ভুত মর্মসন্ধানী প্রশান্তি মাখানো দৃষ্টি বিশেষভাবে মোহিত করেছিল। এই দৃষ্টির উপযুক্ত সংজ্ঞা বোধ হয় প্রজ্ঞাঘন। প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকদের যে উপবেশন গৃহ, সেখানে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের একটি চিত্র আছে। ইংরেজ আমলে তোলা সেই সুন্দর চিত্রটি যেন ওঁর ব্যক্তিত্বের অসাধারণ প্রকাশ।

১৯৩৬ সালে পূর্ববঙ্গের (আমাদের দেশ পূর্ববঙ্গে নয়, পশ্চিমবঙ্গে। বাবার চাকুরীর সুবাদে পূর্ববঙ্গে থাকতে হয়েছিল) পিরোজপুর সরকারি স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করে আমি কলকাতায় এসে ভর্তি হয়েছিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রেসিডেন্সির প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতেই ইতিহাসের ক্লাসে শিক্ষক হিসাবে সুশোভন সরকারকে পাই। এখানে একটানা চার বছর তাঁকে শিক্ষক হিসাবে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছি। আমার ইতিহাসে অনার্স ছিল। সুতরাং দুবছর ইন্টারমিডিয়েডের পর বি.এ. ক্লাসে এসে অনার্সের অধ্যাপক হিসাবে তাঁর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ১৯৩৬-৪০ পর্যন্ত এইভাবে তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের তৎকালীন সহপাঠীদের অনেকে ছিলেন, যাঁরা পরবর্তী জীবনে বিখ্যাত হয়েছিলেন। যেমন, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, সিদ্ধার্থশংকর রায়, সত্যজিৎ রায়, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রণজিৎ গুপ্ত প্রমুখ। তবে বি.এ.-তে অমলেশ ত্রিপাঠীর ইতিহাসে অনার্স ছিল না, ছিল অর্থনীতিতে। এম.এ.-তে আবার তিনি ইতিহাস নিয়ে পড়েন। তখন প্রেসিডেন্সিতে ইতিহাস বিভাগে অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, অধ্যাপক সুরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ।

১৯৪০-এ শিক্ষক সুশোভনবাবুর সঙ্গে আমার সাময়িক বিচ্ছেদ হয়ে যায়। যদিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসেও সুশোভনবাবু পড়াতেন পার্টটাইম অধ্যাপক হিসাবে। তখন ইতিহাসের দুটি বিভাগ ছিল। একটা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অন্যটা বলা হত জেনারেল হিস্ট্রি বা সাধারণ ইতিহাস। জেনারেল হিস্ট্রি বিভাগটি ছিল মিশ্র পাঠক্রম। কিছুটা প্রাচীন ইতিহাস, কিছুটা ইউরোপ ও আধুনিক জগতের অন্যান্য দেশের ইতিহাস, কিছুটা ইংলন্ডের

ইতিহাস—এসব নিয়ে একটা মিশ্র পাঠক্রম। আমার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপরে বিশেষ আকর্ষণ থাকাতে আমি সেটিকেই এম.এ.-র পাঠক্রম হিসাবে নির্বাচন করি। সুশোভনবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসে জেনারেল হিস্ট্রি বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। ফলে এম.এ.-তে তাঁর কাছে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার হয়নি।

এম.এ. পাশ করে বেরোবার পরেও ছাত্র হিসাবে আজীবন তাঁর স্নেহলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি তাঁর ছাত্রদের, বিশেষ করে প্রেসিডেন্সির ছাত্রদের প্রায় প্রত্যেকের খবর রাখতেন এবং বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের খবর নিতেন। যাঁদের ওপর তাঁর ভালো ধারণা ছিল তাঁদের প্রয়োজন মতো অতি আগ্রহের সঙ্গে প্রশংসাপত্রও লিখে দিতেন। একথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

আই.এ. ক্লাসে উনি আমাদের পড়িয়ে ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস। তখনকার কলেজ শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। এবং ইংরেজি ভাষাতেই অধ্যাপনা হত। পাঠ্যপুস্তকও ছিল ইংরেজিতে লেখা। অধ্যাপক সরকার যে গ্রন্থখানি আমাদের পড়তে নির্দেশ করেছিলেন, সেটি হল J.B. Bury-র *History of Creece for beginners*. তিনি ক্লাসে ইংরেজি ভাষাতেই পড়াতেন। তাঁর ইংরেজি বলার মধ্যে একটা সুন্দর দীর্ঘায়ত ছন্দ ছিল। বলতেন ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে। অক্সফোর্ড ফেরৎ অধ্যাপক, কিন্তু চালচলনে, বাচনভঙ্গিতে, উচ্চারণে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ। এতটুকু কৃত্রিমতা কোথাও ছিল না। তিনি জানতেন যে ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্রেরই ইংরেজি শোনা, ইংরেজি বলা বা ইংরেজি ধরণধারনের সঙ্গে পূর্বপরিচয় নেই। তাই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে একখানি ইংরেজি গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাদের মনের মধ্যে প্রকাশ করানো প্রথমেই খুব সহজ হবে না। অন্তত পুরো প্রথম বছরটা ধরে এই ব্যাপারে তাদের ধীরে ধীরে অভ্যাস করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। অধ্যাপনার এই সূক্ষ্ম কৌশলটুকু তাঁর আশ্চর্য-রকম আয়ত্ত ছিল।

Bury-র পাঠ্যবইখানার ইংরেজি শৈলী যে আমাদের সেই অবস্থায় খুব সহজ বোধ হয়েছিল, এমন কথাও বলতে পারি না। সমস্ত বইখানি ধীরে ধীরে অত্যন্ত সহজবোধ্য ইংরেজি ভাষায় নিপুণ বিশ্লেষণ করে তার প্রধান বক্তব্যগুলিকে Pinpoint করে ছাত্রদের মনে গেঁথে দেওয়ার আশ্চর্য দক্ষতা তাঁর ছিল। এমনভাবে তিনি ধীর মন্থর গতিতে বলে যেতেন যে প্রত্যেকটি প্রধান বক্তব্য আমাদের পক্ষে খাতায় লিখে নেওয়া সম্ভব হতো। অবশ্য আমাদের লেখায় যে ভুল থাকতো সেগুলি পরে পরস্পরের লেখা মিলিয়ে আমরা সংশোধন করে নিতাম। তা সত্ত্বেও যেখানে সমস্যা থাকতো ক্লাসের পরে তাঁর কাছে গেলে তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে সংশোধন করে দিতেন। আর একটা কথা এখানে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, তিনি সেই স্তরে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে একগাদা বইয়ের নাম করে ছাত্রদের মনে ভীতি বা বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা কখনোই করতেন না। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এই স্তরে প্রথম স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আসা ছাত্রদের বিদ্যার উচ্চতর ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য একটি উপযুক্ত প্রস্তুতি পর্বের প্রয়োজন আছে। কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যয়ন উচ্চতর মানের সঙ্গে পরিচিত হবার সেই প্রস্তুতি পর্ব। এইখানেই ধীরে ধীরে অভ্যাস হলে উপযুক্ত সময়ে অনার্স ও এম.এ. ক্লাসে উচ্চতর বিদ্যাকে গ্রহণ করা ছাত্রদের পক্ষে

সহজ হবে। পরবর্তী অধ্যাপক জীবনে আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি যে তাঁর এই দৃষ্টি ও অবলম্বিত শিক্ষাদান প্রণালী কী গভীরভাবে সত্য!

ইন্টারমিডিয়েটের পর অনার্স ক্লাসে অধ্যাপক সুশোভন সরকারকে আরও অন্তরঙ্গভাবে পেলাম। তখনকার পাঠক্রমের মধ্যে অনেকগুলি বিষয় পড়ানোর ভার তাঁর উপরেই ছিল। যেমন, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস—১৬৪৮ (ওয়েস্ট ফেলিয়ার সন্ধি) থেকে ১৮১৫ (ভিয়েনার সন্ধি) পর্যন্ত এবং আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস—১৮১৫ থেকে ১৯১৯ (প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি) পর্যন্ত। এ দুটি ছিল তদানীন্তন অনার্স কোর্সের আবশ্যিক বিষয়। ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যেও তিনি আরও দুটি বিষয় পড়াতেন। যেমন, ইউরোপের আধুনিক যুগের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস (Reformation) এবং প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ইতিহাস বা পেলোপনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাস। প্রথম দুটি এবং চতুর্থ বিষয়টি তাঁর কাছে পড়বার সুযোগ আমার হয়েছিল। এইখানেই দেখলাম উচ্চতর ক্ষেত্রে ইতিহাসের শিক্ষাদানে তাঁর অতুলনীয় সিদ্ধি।

ইউরোপীয় ইতিহাস ১৬৪৮ থেকে হঠাৎ আরম্ভ করায় ছাত্রদের মনে কিছুটা বিমূঢ়তার সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকতো। কারণ এর প্রেক্ষাপটটি তদানীন্তন পাঠক্রমে ছাত্রদের সম্পূর্ণ অজানা থাকতো। তদানীন্তন ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাসে ইতিহাস আবশ্যিক বিষয় ছিল না। এবং যারা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ইতিহাস পড়তেন তাদেরও ইউরোপের ইতিহাস পড়বার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের অর্থাৎ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিকাশের কোন ধারণাই ছাত্রদের মনে গড়ে উঠত না। অধ্যাপক সরকার মর্মে মর্মে সমস্যাটি বুঝতেন। তাই তিনি তাঁর অনবদ্য বিশ্লেষণী ভাষণে এই পেপারটির একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা বেশ কিছুদিন ধরে করে যেতেন। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে যে যে উপাদানে ইউরোপে মধ্যযুগের অভিব্যক্তির ধারা কাটিয়ে ক্রমশ একালের রাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক আর্থ সামাজিক এবং মানসিক রূপান্তর ঘটেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ বিবরণ ছাত্রদের মনের মধ্যে গেঁথে দিতেন। তংকৃত এই ভূমিকাটির আয়ুষ্কাল অন্তত পক্ষে ছ'মাস, এমন কি কখনো আরও বেশি হত। এর ফলে যখন ওয়েস্ট ফেলিয়ার সন্ধির আলোচনা শুরু হতো তখন ছাত্রদের মনের ধাঁধা সম্পূর্ণ কেটে যেত ও পরবর্তী ঘটনাস্রোত অনুসরণ করতে তাদের আর কোন অসুবিধাই থাকতো না। এইভাবে তদানীন্তন স্কুল-কলেজের ইতিহাস পাঠক্রমের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য-অসংগতি ছিল তিনি নিজের দূরদর্শিতার সাহায্যে একরকম এককভাবেই তা দূর করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

অনার্স ক্লাসেও দেখতাম তাঁর অধ্যাপনার মূল ধারাটি তিনি বজায় রেখে চলেছেন, যা আই.এ. ক্লাসে প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য করেছিলাম। ধীরে ধীরে অত্যন্ত জটিল বিষয়গুলিকে অপূর্ব বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে সুন্দর অথচ সহজবোধ্য ইংরেজিতে তিনি এমন স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্টভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতেন যে অন্যমনস্ক হবার কোন সুযোগই থাকতো না। মনের মধ্যে তা একেবারে বদ্ধমূল হয়ে যেত। তাঁর ক্লাসরুম লেকচারগুলির এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে ছাত্ররা এগুলি প্রায় সম্পূর্ণই লিখে নিতে পারতো অথচ তিনি একটি দিনের জন্যও ক্লাসে নোট

ডিকটেট করেন নি। সেই বক্তৃতার সারাংশগুলি সেদিন যা টুকে নিয়েছিলাম আজও সেই খাতাগুলি কিছু কিছু আমার কাছে আছে। মাঝে মাঝে সেগুলি উল্টে এখনও নিজের ছাত্র-জীবনের সেই অভিজ্ঞতার জগতে ফিরে যাই। তাঁর অবলম্বিত এই পদ্ধতি উত্তর জীবনে আমার নিজের অধ্যাপনার কাজে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে।

অধ্যাপক রূপে আর একটি অভ্যাসের জন্য ছাত্ররা তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করতেন। প্রতিদিন ক্লাস শেষ হবার ঠিক পূর্বের কয়েক মিনিট তিনি এতক্ষণ যা আলোচনা করলেন পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তার সারাংশটি পুনরাবৃত্তি করতেন। ফলে যেন একটি চকিত উদ্ভাসে আলোচ্য বিষয়টি তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছাত্রদের মনে শেষবারের মত ঝলক দিয়ে যেতো। আবার পরবর্তী ক্লাসে বিষয়টির পরবর্তী পর্ব যখন আরম্ভ হতো তার পূর্বে তিনি গতদিন যা আলোচনা করেছেন, অতি সংক্ষেপে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট সেটির উপস্থাপনা করে পরবর্তী পর্বে প্রবেশ করতেন। এই যুগল পদ্ধতিতে আমাদের কারো বিষয়বস্তুর খেই হারিয়ে দিগভ্রান্ত হবার ভয় থাকতো না। আলোচ্য বিষয় বস্তুর ধারাবাহিকতা ও কার্যকারণ শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বজায় থাকতো। আমার ছাত্রজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আর মাত্র দুজন অধ্যাপককে এই একই বিশ্লেষণী পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখেছি। এঁদের একজন হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাসের কারমাইকেল অধ্যাপক প্রয়াত মনীষী হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগের মহাচার্য পন্ডিত শ্রীমোহন তর্কবেদান্ত তীর্থ।

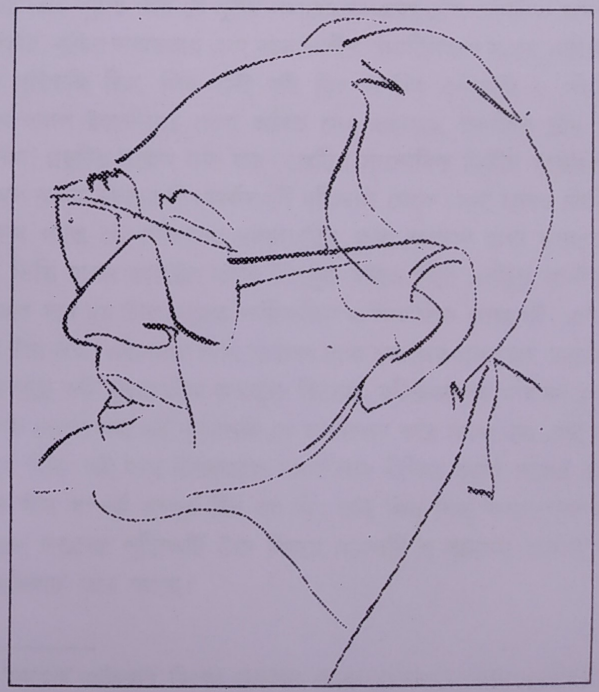

সুশোভন সরকার *শিল্পী : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত*

অনার্স ক্লাসেও দেখেছি, অযথা রেফারেন্স দিয়ে ছাত্রদের ভারাক্রান্ত করবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। ইউরোপের ইতিহাসের দ্বিতীয় পেপারে যে কয়টি বই পাঠ্য ছিল—যেমন ওয়েক-ম্যানের *The Ascendency of France,* হ্যাসালের *The Balance of Power,* মোর স্টিফেন্সের *Revolutionary Europe* এবং তৃতীয় পেপার হেজেনের *Europe since 1815* ও ফয়টারের *World History* ছাড়া তিনি সচরাচর অন্য কোন বই পড়তে বলতেন না। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে ম্যাদেলাইন ও টম্পসনের বই দুখানির উল্লেখ মনে আছে। অধ্যাপক ফিশার রচিত 'নেপোলিয়ান' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি এবং দুজন স্বনামধন্য দার্শনিক-ঐতিহাসিক বার্টরান্ড রাসেল ও বেনিদেত্তো ক্রোচে রচিত যথাক্রমে *Freedom and Organization* ও *History of Europe in the 19th Century* বই দুখানিও তিনি সাধারণভাবে আমাদের পড়তে অনুরোধ করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসের বিশেষ পর্ব পড়াতে তিনি সমসাময়িক গ্রীক ইতিহাসের থুকিদিদেস্-এর সমসাময়িক বিবরণ হিসট্রি অব দি পেলোপেনেসীয় ওয়ার (ইংরেজি অনুবাদ) ধরে ধরে পড়াতেন। বাদবাকি রেফারেন্সের মধ্যে ছিল কেমব্রিজ এনসিয়েন্ট হিসট্রির পঞ্চম খন্ড এবং হেন্ডারসনের *The great war between Athens & Sparta.*

আমাদের সময়কার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের সেমিনারটি খুব সজীব ছিল। নিয়মিত অধিবেশন হতো। অধিকাংশ সময়েই অধ্যাপক সরকার সভাপতিত্ব করতেন। এই উপলক্ষে আমরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে জলযোগের আয়োজন করতাম। তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ছাত্রদের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া। এই প্রবন্ধগুলি লিখে দিলে তিনি অতি যত্ন ও পরিশ্রমের সঙ্গে খাতাগুলি সংশোধন করতেন এবং তাতে নম্বর দিতেন। এই খাতা সংশোধন করতে গিয়ে তিনি যে কি পরিশ্রম করতেন তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। প্রতিটি অনুচ্ছেদ মন দিয়ে পড়ে প্রয়োজন মত সুদীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে যখন খাতা ফেরৎ দিতেন তখন লেখার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমরা পূর্ণভাবে সচেতন হয়ে উঠতাম। শিক্ষকতা যে কি যত্ন, নিষ্ঠা, পরিশ্রমের কাজ এবং তাঁরজন্য যে কত সময় দিলে আদর্শ শিক্ষকের স্তরে পৌঁছন যায় অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

সেমিনারের অধিবেশনগুলিতে ছাত্রদের কোনও একজনকে প্রতিবারে কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করতে হতো। এবং পরে প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপস্থিত সকলে প্রশ্ন ও আলোচনা করতেন। সবশেষে সভাপতি রূপে অধ্যাপক সরকার সুদীর্ঘ মন্তব্য সহকারে উপসংহার টানতেন। তাঁর সেই মন্তব্য নানা বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দিত।

অধ্যাপক সরকার পরিণত বয়সে মার্কসবাদকে সমাজদর্শন রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি মার্কসবাদী রূপেই পরিচিত ছিলেন। অনার্সের তৃতীয় পেপারে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদের উদ্ভব ও পরিণতি তাঁর অধ্যাপনার বিষয়বস্তু ছিল এবং তাঁর কাছে সে বিষয়টিও অপরাপর নানা বিষয়ের মত অধ্যয়নের সুযোগ আমাদের ঘটেছিল। এ বিষয়ে আমরা সৌভাগ্যবান। অন্যান্য বিষয়ের মতই ইউরোপের ইতিহাসে মার্কসবাদী পর্বের আলোচনা ক্ষেত্রেও দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তার আলোচনার স্বচ্ছতা ও সুনির্দ্দিষ্টতা। এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সম্পূর্ণ বিষয়মুখীতা ও সততা। মার্কসবাদে তাঁর নিজের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তাঁর ঐ বিষয়ক অধ্যাপনার মধ্যে এতটুকু প্রচারধর্মীতা ছিল না। তিনি এক মুহূর্তের জন্য

তাঁর নিজের বিশ্বাস ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। শুনেছি, এই বিশ্বাসের জন্য সরকারি কর্মক্ষেত্রে তাঁকে কিছু অবিচার সহ্য করতে হয়েছিল। উপযুক্ত সময়ে যোগ্যতানুসারে তিনি উচ্চতর পদে একাধিকবার উন্নীত হননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস অটুট ছিল। কখনো মাথা নোয়ান নি।

অধ্যাপক সরকারের সম্পর্কে একটা সমালোচনা শোনা যায়। তিনি আজীবন ইতিহাসের অধ্যাপনা করে গেলেন, অথচ কোনদিন কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করলেন না। কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। তিনি অধ্যাপক জীবনের প্রথম দিকে অষ্টাদশ শতকের ভারত-নেপাল সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন। এ বিষয়ে দু'একটি প্রারম্ভিক প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৩৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনের Proceedings-এ মুদ্রিত তাঁর *'The Nepal Frontier in the 18th Century'* নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যেতে পারে। শুনেছি এ জাতীয় ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধ দু'একটি অন্যত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। কি কারণে এই গবেষণার কাজটি তিনি সম্পূর্ণ করেন নি তা বলতে পারি না। কিন্তু প্রথাসম্মত গবেষণা ক্ষেত্রে অধিক অগ্রসর না হলেও সারাজীবন জ্ঞানচর্চা ও বিভিন্ন বিদ্যানুশীল যে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তাঁর ইংরেজি বাংলা প্রবন্ধগুলি এর উপযুক্ত নিদর্শন হিসাবে বিদ্যমান। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকাকে ঘিরে যে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, অধ্যাপক সুশোভন সরকার ছিলেন তার অন্যতম প্রধান। 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় তাঁর যে সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি জ্ঞানের গভীরতায়, বুদ্ধির ভাস্বরতায় এবং রচনাশৈলীর সাবলীলতায় বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তাঁর মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কিন্তু সেই দৃষ্টি ছিল সর্ববিধ গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজিতে লেখা অমিত সেন ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর *'নোটস্ অন বেঙ্গল রেনেসাঁস'* গ্রন্থটির উল্লেখ করা যায়। গ্রন্থটির সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে, তবে মূল বক্তব্য বদলায় নি। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হলেও তিনি রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে গৌরবময় নবজাগৃতির ধারা বাংলার তথা ভারতের আধুনিক মনন জগতের ভিত্তি স্থাপন করেছিল তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে এতটুকু কার্পণ্য করেন নি। এর কারণ আমার মনে হয় তাঁর নিজের পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট। একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম পরিবারে তাঁর জন্ম। একসময়ে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণপুরুষ স্বনামধন্য সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা যুবমন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ সদস্য পদ দেবার জন্য এই যুবমন্ডলী যে আন্দোলন করে সফল হন, সেই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। এই জন্য উত্তরকালে মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার পরেও এই লিবারেল ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নি। তাই কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁর বাংলা নবজাগরণ সংক্রান্ত পুস্তিকাটি উক্ত বিষয়ে বামপন্থী ও অন্যান্য রচনার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

□ স্মৃতিকথাটি 'কোরক' পত্রিকার বিশেষ মূল্যায়ন সংখ্যা (১৪০৭) থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হলো।